BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/04040018

Available Online: www.bijmrd.com | BIJMRD Volume: 4 | Issue: 04 | April 2026 | e-ISSN: 2584-1890

বাণী বসুর কথাসাহিত্যে ইতিহাসচেতনা ও বৌদ্ধ দর্শন: মধ্যবিত্ত সত্তার পাঠ

Sourav Mukherjee[1] & Dr. Chandra Sekhar Halder[2]

1. Ph.D. Research Scholar, Department of Bengali, YBN University, Ranchi, Jharkhand
2. Assistant Professor, School of Arts and Humanities (Dept. of Bengali), YBN University, Ranchi,

সারসংক্ষেপ (Abstract): *বাণী বসুর কথাসাহিত্যে ইতিহাসচেতনা ও বৌদ্ধ দর্শন এক গভীর মানবিক ও দার্শনিক পরিসর নির্মাণ করে, যার কেন্দ্রে অবস্থান করে মধ্যবিত্ত সত্তার সংকট ও আত্মঅনুসন্ধান। তাঁর উপন্যাসে ইতিহাস কেবল অতীতের বিবরণ নয়; বরং তা সমসাময়িক অভিজ্ঞতা, স্মৃতি ও সামাজিক বাস্তবতার আলোকে পুনর্গঠিত এক গতিশীল চেতনা। বিশেষত নকশাল আন্দোলনের মতো ঘটনাপ্রবাহ মধ্যবিত্ত জীবনের মূল্যবোধ ও স্থিতিকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায়, যা তাঁর রচনায় শিল্পিতভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। অন্যদিকে, বৌদ্ধ দর্শনের চার আর্যসত্য, প্রতীত্যসমুৎপাদ এবং আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের ধারণা তাঁর চরিত্রচিত্রণ ও ভাবনাপ্রবাহে অন্তর্নিহিতভাবে উপস্থিত। দুঃখ, অনিত্যতা, তৃষ্ণা ও মুক্তির অনুসন্ধান চরিত্রদের মানসিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়, যা মধ্যবিত্ত জীবনের অস্তিত্বগত সংকটকে দার্শনিক ব্যাখ্যা প্রদান করে। এইভাবে ইতিহাস ও বৌদ্ধ ভাবনার সমন্বয়ে বাণী বসু এক মানবকেন্দ্রিক, অন্তর্মুখী ও সমকালীন জীবনবোধ নির্মাণ করেছেন, যা বাংলা কথাসাহিত্যে একটি স্বতন্ত্র তাৎপর্য বহন করে।*

মূল শব্দ (Keywords): *বৌদ্ধ দর্শন, চার আর্যসত্য, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, প্রতীত্যসমুৎপাদ, সংযম ও ধ্যান, মুক্তির ধারণা, জীবনচক্র (জন্ম–জরা–মৃত্যু)।*

বাংলা উপন্যাসে ইতিহাস কেবল অতীত ঘটনার নিরপেক্ষ বিবরণ নয়; বরং তা লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনবোধের আলোকে নতুন অর্থে রূপায়িত হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে বাণী বসুর উপন্যাসে ইতিহাস এক গতিশীল ও মানবকেন্দ্রিক চেতনা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে, যা চরিত্রের অন্তর্জগত, নৈতিক সংকট ও সামাজিক বাস্তবতার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। তিনি ইতিহাসকে নিছক প্রামাণ্য তথ্যের পুনরাবৃত্তি হিসেবে দেখেন না; বরং স্মৃতি, অভিজ্ঞতা ও মানসিক টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে তাকে পুনর্নির্মাণ করেন। একই সঙ্গে তাঁর উপন্যাসে বৌদ্ধ দর্শনের প্রভাবও তাৎপর্যপূর্ণ। দুঃখ, অনিত্যতা, করুণা, অনাসক্তি ও আত্মঅনুসন্ধানের মতো বৌদ্ধ ভাবনা চরিত্রচিত্রণ ও জীবনদৃষ্টিকে গভীরতা প্রদান করে। বিশেষত মধ্যবিত্ত সমাজের দ্বন্দ্ব, সংকট ও অস্তিত্বগত প্রশ্নগুলিকে এই দর্শন এক ভিন্ন ব্যাখ্যার ক্ষেত্র তৈরি করে। ফলে ইতিহাস ও বৌদ্ধ ভাবনার সংলাপে বাণী বসু মধ্যবিত্ত মানসজগতের জটিলতা ও অন্তর্লীন বোধকে সূক্ষ্মভাবে উন্মোচিত করেছেন। ড.অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন— "দেশ-কাল-পাত্রকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে ইতিহাস, সাহিত্যের ইতিহাসও তারই অন্তর্ভুক্ত। নদীর মতো ইতিহাসের গতি কখনো ঋজু পথ ধরে চলে, কখনও-বা ভুজঙ্গগতি। সাহিত্যের ইতিহাসের চরিত্রও সেই ধারা অবলম্বন করে বিবর্তিত হয়। সে কথা স্পষ্ট হবে সহস্রবর্ষব্যাপী বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে।"[১]

বাণী বসুর উপন্যাসে ইতিহাস নিছক ঘটনার বিবরণ নয়; বরং মানবজীবনের অভিজ্ঞতা, স্মৃতি ও বোধের আলোকে পুনর্নির্মিত এক গতিশীল চেতনা। তিনি ইতিহাসকে প্রামাণ্য তথ্যের পুনরুৎপাদন হিসেবে নয়, চরিত্রের মানসিক সংকট, নৈতিক দ্বন্দ্ব ও জীবনসংগ্রামের মাধ্যমে নতুন অর্থে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর রচনায় রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের চেয়ে সাধারণ মানুষের জীবন,

বিশেষত নারীর অভিজ্ঞতা ও আত্মসংকট বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। যদিও তিনি সচেতনভাবে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেননি, তবু তাঁর সাহিত্যচেতনায় ইতিহাসবোধ সুস্পষ্ট। সমসাময়িক সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতাকে গ্রহণ করে তিনি ইতিহাসকে একটি মানবকেন্দ্রিক ও বহুমাত্রিক অভিজ্ঞতায় রূপ দিয়েছেন, যা বিকল্প ইতিহাসপাঠের সম্ভাবনা উন্মোচন করে।

'অন্তর্ঘাত' উপন্যাসে বাণী বসুর ইতিহাসচেতনার প্রসঙ্গে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। এই উপন্যাসে স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের এক গভীর সংকটময় রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার শিল্পিত প্রতিফলন পাওয়া যায়—যা ১৯৬৭ সালের নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। এই আন্দোলন বাংলার দীর্ঘদিনের সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধকে ভেঙে নতুন এক আদর্শ নির্মাণের স্বপ্ন দেখিয়েছিল। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়নি; বরং সমাজ ও ব্যক্তিমানসে সৃষ্টি হয়েছিল গভীর ভাঙন ও বিপর্যয়। বাণী বসু এই আন্দোলনের ঐতিহাসিক বিবরণ দিতে চাননি, বরং আন্দোলনের অন্তর্গত সংকট, ব্যর্থতা ও মানসিক অভিঘাতকে তাঁর উপন্যাসের মূল আলোচ্য করে তুলেছেন।

"আমাদের দেশে বিপ্লব নেহাত কম হয়নি বিবি। ১৮৫৭র বিপ্লব, তেলেঙ্গানা আন্দোলন, তেভাগা আন্দোলন, সাঁওতাল বিদ্রোহ। কিন্তু কোনওটাই শেষ পর্যন্ত টেম্পো ঠিক রাখতে পারেনি, কেন জানিস? পেছনে একটা পরিষ্কার তত্ত্বের জোর ছিল না। তত্ত্বের দিকটা তাই প্রত্যেকটি ক্যাডারের কাছে জলবৎ হওয়া চাই। তাই-ই এত বকবক করছি। আমাদের প্রাথমিক কাজ বিপ্লবকে সফল করে তোলা। তারপর শিক্ষানীতির নয়া ব্লু-প্রিন্ট হাতে পাব। তোর জানার নেশা বেশি বলেই তো আজ তোকে একজনের কাছে নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবছি। দেখবি সব সংশয় কীভাবে উড়ে যায়। আচ্ছা এবার বেরো তো।"[২]

'অন্তর্ঘাত'-এর কাহিনিপট যে নিছক কল্পনাপ্রসূত নয়, তার প্রমাণ লেখিকার নিজস্ব বক্তব্যেই স্পষ্ট। নকশাল আন্দোলনের সময় তিনি প্রত্যক্ষভাবে যে অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছিলেন—কলেজ জীবন, পারিবারিক পরিসর ও আশপাশের সমাজ—সেই সবকিছুর ছাপ উপন্যাসের বিভিন্ন পর্বে ছড়িয়ে আছে। বাস্তব জীবনে দেখা ঘটনা, উৎখাত হওয়া পরিবার, তরুণদের বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে যুক্ত হওয়া এবং তার পরিণতি—এই সমস্ত অভিজ্ঞতা তাঁর লেখনীতে রূপ পেয়েছে সাহিত্যিক পুনর্গঠনের মাধ্যমে। বিশেষত আত্মহত্যার একটি ঘটনা থেকে উপন্যাসের কেন্দ্রীয় ভাবনার সূত্রপাত—এই তথ্য লেখিকার ইতিহাস-অনুভবের গভীরতা নির্দেশ করে। এখানে আত্মহত্যা কেবল ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডি নয়; তা এক ধরনের নৈতিক অপরাধবোধ, রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও আত্মঘাতী চেতনার প্রতীক। নকশাল আন্দোলনের সময়কাল মূলত সত্তরের দশক হলেও, বাণী বসু 'অন্তর্ঘাত' রচনা করেন আশির দশকের শেষভাগে। এই সময়গত দূরত্ব তাঁকে আন্দোলনকে আবেগের বদলে বিচার-বিশ্লেষণের দৃষ্টিতে দেখার সুযোগ দেয়। উপন্যাসের কাহিনি মূলত দুটি স্তরে বিন্যস্ত—আন্দোলন চলাকালীন সময় এবং আন্দোলন-পরবর্তী জীবন। এই কাঠামোর মধ্য দিয়ে লেখিকা দেখাতে চেয়েছেন, সহিংস বিপ্লব শেষ হয়ে গেলেও তার ক্ষত ও মানসিক অভিঘাত দীর্ঘদিন মানুষের জীবনে বহমান থাকে। তিনি আন্দোলনের ঘটনাপঞ্জি রচনা করেননি; বরং আন্দোলনের ব্যর্থ মনস্তত্ত্বকে উন্মোচিত করেছেন।

"বাহাত্তর সালের অক্টোবর মাসে শিমলিপালের জঙ্গলে এক পোচারদের গোপন আড্ডা থেকে সুমন্ত সেনগুপ্তকে যখন ধরা হয় বেঙ্গল পুলিশ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেও ফেলেনি। কারণ তারা ভাবেনি-শহুরে গেরিলাদের অন্যতম সেনানায়ক সেনগুপ্তর মুখ থেকে আদৌ কোনও কথা বের করা যাবে। কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল ব্যাপারটা সোজা। দুদিন রাজার হালে রাখার পর তৃতীয় দিনে থার্ড ডিগ্রি প্রয়োগ করা হয়েছে কি হয়নি, সুমন্ত সেনগুপ্ত একেবারে কোল্যাপস্ করল। নকশাল গেরিলাদের যে যে ওর গ্রুপে ছিল সবার নাম ধাম এবং আর যা কিছু তথ্য গলগল করে বলে সুমন্ত সেনগুপ্ত অজ্ঞান হয়ে গেল। তার দেওয়া খবরের ওপর নির্ভর করেই প্রধানত বাদবাকি নকশালদের রাউন্ড আপ করা হয়, যার মধ্যে ছিল শীর্ষ চক্রবর্তী, সৌম্য চক্রবর্তী এবং ছিলেন আপনি, বিবি।"[৩]

"অন্তর্ঘাত' উপন্যাসে একাধিক আত্মহননের ঘটনা নকশাল আন্দোলন-পরবর্তী গভীর মানসিক সংকট ও অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রতীক হিসেবে উপস্থিত। জয়ন্তী, সুমন্ত, ব্রততী, শীর্ষ প্রমুখ চরিত্রের অভিজ্ঞতায় অত্যাচার, অপরাধবোধ ও বিশ্বাসভঙ্গের ফলে সৃষ্ট ভাঙন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সুমন্তের ডায়েরিতে এই আত্মসমালোচনামূলক মানসিকতার গভীরতা ধরা পড়ে। বাণী বসু দেখিয়েছেন, বিপ্লবের তাত্ত্বিক আদর্শ বাস্তব সহিংসতার মুখে টেকে না; ফলে যুবসমাজ সহজেই বিপর্যস্ত হয়। আন্দোলনের নেতৃত্বও অনেক ক্ষেত্রে তরুণদের ব্যবহার করেছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে। এই প্রেক্ষিতে লেখিকা ইঙ্গিত করেন যে, নকশাল আন্দোলন সুসংহত তাত্ত্বিক ভিত্তির অভাবে ব্যর্থ হয়েছিল। উপন্যাসে অন্যান্য ঐতিহাসিক বিদ্রোহের প্রসঙ্গ টেনে তিনি দেখান, 'ভাঙা'-কেন্দ্রিক বিপ্লবের সঙ্গে

‘গড়া’-র দর্শনের অভাবই মূল সংকট। ফলে ‘অন্তর্ঘাত’ কেবল একটি রাজনৈতিক আন্দোলনের ব্যর্থতার কাহিনি নয়, বরং তা মানবিক ট্র্যাজেডির মাধ্যমে ইতিহাসের অভিঘাতকে উপলব্ধির এক গভীর পাঠ।

বাণী বসুর **উত্তরসাধক** উপন্যাসে ইতিহাস কোনো প্রত্যক্ষ ঘটনাক্রম বা কালানুক্রমিক বিবরণ হিসেবে উপস্থিত নয়। এখানে ইতিহাস মূলত একটি অভিজ্ঞতালব্ধ চেতনা হিসেবে কাজ করেছে, যা চরিত্রের জীবনদর্শন ও সামাজিক দায়বদ্ধতার বিকাশে প্রভাব ফেলেছে। নকশাল আন্দোলনের পরবর্তী বাস্তবতায় একজন প্রাক্তন আন্দোলনকারীর আত্মবিশ্লেষণ এবং বিকল্প সমাজপথের অনুসন্ধানই এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় বিষয়। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র মেধা ভাটনাগরের কৈশোরকাল নকশাল আন্দোলনের আবহে গড়ে ওঠে। সেই আন্দোলনের আদর্শিক উচ্ছ্বাস, সংগঠনের দুর্বলতা এবং শেষ পর্যন্ত তার ব্যর্থতা তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। আন্দোলন থেকে সরে এসে দীর্ঘ সময় ইতিহাস অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে তিনি অতীতকে বুঝতে চেষ্টা করেন। কিন্তু এই অধ্যয়ন তাঁর কাছে কেবল জ্ঞান আহরণের প্রক্রিয়া হয়ে থাকে না; বরং ইতিহাসের পাঠ থেকেই তিনি উপলব্ধি করেন যে সমাজ পরিবর্তনের জন্য তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের পাশাপাশি সক্রিয় মানবিক উদ্যোগ অপরিহার্য। এই উপলব্ধিই তাঁকে সমাজসেবামুখী কর্মপথে উদ্বুদ্ধ করে। মেধা ভাটনাগর চরিত্রটি নির্মাণে বাণী বসু বাস্তব ইতিহাস ও সমকালীন সামাজিক আন্দোলনের প্রভাব গ্রহণ করেছেন। একজন সংগ্রামী নারীচরিত্রের আদর্শ ও কর্মপ্রেরণা উপন্যাসের চরিত্ররূপে রূপান্তরিত হয়েছে। ফলে উত্তরসাধক-এ ইতিহাস কেবল অতীতের স্মৃতি নয়, বরং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নির্মাণের প্রেরণাশক্তি হিসেবে কাজ করেছে। এই উপন্যাসে লেখিকা ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি দীর্ঘস্থায়ী সংকটকে চিহ্নিত করেছেন। স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে নকশাল আন্দোলন পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়েই ছাত্রসমাজ ও মধ্যবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের তরুণরা আন্দোলনের প্রধান শক্তি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু পরিকল্পনার অভাব ও রাজনৈতিক স্বার্থপরতার কারণে এই বিপুল প্রাণশক্তির সঠিক ব্যবহার সম্ভব হয়নি। সময়ের প্রয়োজনে তাদের ত্যাগ গ্রহণ করা হলেও, পরবর্তীকালে তাদের অবদান উপেক্ষিত থেকেছে।

“সন্তানের ওপর নির্যাতনের কথা উঠলেই তো আগে ভারতবর্ষের কন্যা-হত্যা, সতীদাহ, বিধবা-হত্যা ইত্যাদির উদাহরণ তুলে ধরা হয়। ইংল্যান্ডের ষোড়শ সপ্তদশ শতাব্দীর ঘটনা জানো? নিজের বারো তেরো বছরের মেয়েকে বৃদ্ধ ডিউকের সঙ্গে বিয়েতে রাজি করানোর জন্য তার বাবা-মা এমন অকথ্য অত্যাচার করে যে মেয়েটি মারা যায়। এর পেছনে কী? ডিউকের দেওয়া ভূ-সম্পত্তির লোভ। আমাদের দেশে শিশু কন্যা হত্যার পেছনে কী ছিল? সমাজের চাপ। আবার দেখো, ধনী দেশগুলো এখন অনাথ-বাচ্চাদের দত্তক নিচ্ছে। নিজেদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মানুষ করে তুলছে এ-ও তো হচ্ছে! একই সঙ্গে সমাজে দেখবে কেউ মানবিক গুণের আকর, কেউ আবার স্বার্থপর দানব। মূল বিষয় থেকে বোধ হয় অনেকটা সরে এলুম। রঘুদা আসল কথা সব সময়েই আমাদের কাজ হবে মানবিকতাকে সাহায্য করা, প্রোমোট করা।”[৪]

এই অবহেলার ফল সবচেয়ে গভীরভাবে আঘাত করেছে সেইসব পরিবারকে, যাদের সন্তানরা আন্দোলনে অংশ নিয়ে আত্মবলিদান দিয়েছে বা জীবন থেকে বিচ্যুত হয়েছে। সামাজিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক উত্তরণের যে সম্ভাবনা তাদের সামনে ছিল, তা চিরতরে রুদ্ধ হয়ে গেছে। ইতিহাসে কিছু নাম স্মরণীয় হয়ে থাকলেও, সেই ইতিহাসের ছায়ায় থাকা অসংখ্য পরিবার রয়ে গেছে নীরব ও অদৃশ্য অবস্থায়।

লেখিকার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এই ইতিহাসচেতনার নির্মাণে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত পরিবারের উত্তরসূরিদের সামাজিক অবস্থান প্রত্যক্ষ করার অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি উপলব্ধি করেছেন আত্মত্যাগের পরিণতিতে সৃষ্ট শূন্যতা ও অবমূল্যায়ন। এই বাস্তব অভিজ্ঞতাই উত্তরসাধক উপন্যাসে প্রজন্মান্তরের বেদনাকে গভীর ও সংযত ভাষায় প্রকাশের সুযোগ দিয়েছে। এইভাবে উত্তরসাধক উপন্যাসে বাণী বসু প্রত্যক্ষ ঐতিহাসিক বিবরণ পরিহার করেও ইতিহাসের সামাজিক অভিঘাত, রাজনৈতিক ব্যর্থতা এবং মানবিক পুনর্গঠনের সম্ভাবনাকে শিল্পিতভাবে উপস্থাপন করেছেন। সীমিত পরিসরের মধ্যেই উপন্যাসটি ইতিহাসচেতনার এক অন্তর্মুখী, পরিণত ও বাস্তবমুখী রূপ নির্মাণ করেছে।

এবার **‘জন্মভূমি মাতৃভূমি’** উপন্যাসে বাণী বসুর রচনা চেতনার কেন্দ্রে সরাসরি কোনো ইতিহাসবোধ কার্যকর নয়। এখানে তিনি ইতিহাসের ঘটনা নয়, বরং এক প্রবাসী ভারতীয় দম্পতি ও তাদের সন্তানদের মানসিক অভিজ্ঞতার কথা বলতে চেয়েছেন। উপন্যাসের দম্পতির কর্মজীবন ও দৈনন্দিন জীবনযাপন গড়ে উঠেছে আমেরিকার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে, যদিও জন্মগতভাবে তারা ভারতীয়। এই দ্বৈত অবস্থান থেকেই ‘জন্মভূমি’ ও ‘মাতৃভূমি’—এই দুটি আলাদা চেতনার সংঘাত উপন্যাসে

ধীরে ধীরে উন্মোচিত হয়। তাদের সন্তান বাবু ওরফে স্বদেশ এবং মনি ওরফে আরাত্রিকার বেড়ে ওঠা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পূর্ণভাবে আমেরিকাকেন্দ্রিক। কিন্তু একটি বিশেষ পর্বে যখন তারা ভারতবর্ষে ফিরে আসে, তখন স্বদেশের মানসলোকে অতীতের স্মৃতি নতুন করে সাড়া জাগায়। এই স্মৃতি মূলত দিদুর মুখে শোনা গল্প ও পারিবারিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আসে। সেই স্মৃতিচারণার ভেতর দিয়েই বাংলার নকশাল আন্দোলনের একটি প্রতিচ্ছবি স্বদেশের চিন্তাজগতে প্রবেশ করে। বেআইনি অস্ত্র লুকিয়ে রাখা, পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও আন্দোলনকারীদের প্রতি নীরব সহানুভূতি—এই সব অনুষঙ্গ স্বদেশের ভাবনায় ধরা দেয়। সমগ্র উপন্যাসে নকশাল আন্দোলনের উপস্থিতি অত্যন্ত সীমিত; কেবল এই স্মৃতিপর্বেই তার উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে এই সীমিত উপস্থিতি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। 'অন্তর্ঘাত' উপন্যাসে যেমন ব্রততী ওরফে বিবিকে অস্ত্র লুকিয়ে রাখার কারণে 'অগ্নিকন্যা' ও 'অস্ত্রাগার' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল, 'জন্মভূমি মাতৃভূমি'-তেও স্বদেশের স্মৃতিতে আমরা অনুরূপ একটি পারিবারিক চিত্র পাই। দিদুর গোপনে অস্ত্র লুকিয়ে রাখা ও বিপ্লবী আত্মীয়কে আর্থিক সাহায্য করার স্মৃতি দেখায়, কীভাবে সাধারণ পরিবারও রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে অনিচ্ছাকৃতভাবে জড়িয়ে পড়েছিল। এই স্মৃতিচারণার মধ্য দিয়ে বাণী বসু ইতিহাসের ঘটনার পুনর্নির্মাণ করেন না; বরং ইতিহাস কীভাবে প্রজন্মের পর প্রজন্মের মানসচেতনায় ক্ষীণ অথচ স্থায়ী ছাপ রেখে যায়, সেটিই তুলে ধরেন— "দিদুর বাবা স্বাধীনতা আন্দোলনে মারা যান। আমার দাদুও কিছুদিন জেল খেটেছিলেন। দিদু বলতেন-'তেরো বছর বয়সে নোলকপরা ছোট্ট পিতৃহীন মেয়েটি, সবাই বিয়ে দিয়ে দিলে। আরেকটা জীবন পেলে নিশ্চয় অন্যভাবে কাটাতুম।' বড় পিসির ছেলে দীপকদা যখন নকশাল হয়ে গেল, দিদু ওকে চুপি চুপি টাকা দিতেন, ওর পাঠানো অস্ত্রশস্ত্র নিজের তোরঙ্গে শাড়ির তলায় রেখে দিতেন আমি জানি। দীপকদা নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে, দিদু গুম হয়ে গিয়েছিলেন। আমাকে বলতেন- 'দীপককে ওরা মেরে ফেলেছে এ কখনও সত্যি হতে পারে না। দীপকের মধ্যে আগুন আছে।'"[৫]

নকশাল আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাণী বসু যে তিনটি উপন্যাসে ভিন্ন ভিন্ন রূপে তার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন, তা বাংলা সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবণতার অংশ। নকশাল আন্দোলন নিয়ে বাংলা সাহিত্যে বহু ঔপন্যাসিক তাঁদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উপন্যাস রচনা করেছেন। একই ঐতিহাসিক ঘটনা সাহিত্যিকের মনোভূমিতে ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রতিফলিত হওয়ায় একাধিক স্বতন্ত্র উপন্যাসের জন্ম হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে নকশাল আন্দোলন বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কয়েকটি উপন্যাসের নাম উঠে আসে, যা আন্দোলনটির বহুমাত্রিক সাহিত্যিক প্রতিফলনের দিকটি স্পষ্ট করে।

এরপর বাণী বসু মানবজাতির ইতিহাস অনুসন্ধান করেছেন **'উজান-যাত্রা'** উপন্যাসে। এখানে ইতিহাস আর সমসাময়িক রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; তা বিস্তৃত হয়েছে ভারতের আদি মানুষের ইতিহাসে। উপন্যাসে ইতিহাসকে একটি নির্দিষ্ট ঘটনার পঞ্জি হিসেবে দেখা হয়নি; বরং এক প্রবহমান প্রক্রিয়া হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। কস্তুরী মেহতার কণ্ঠে উচ্চারিত ইতিহাস-ভাবনা ইতিহাসকে এক বিশাল স্রোতের সঙ্গে তুলনা করে—যা নিজের অজানা গতিপথে মানুষকে কোথায় নিয়ে যাবে, তা কেউ নিশ্চিতভাবে জানে না। উপন্যাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র কাজল সিং মুণ্ডা একজন ইতিহাসগবেষক। তার অনুসন্ধানের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে মুণ্ডা ও সাঁওতাল জনজাতির অতীত পরিচয় ও ধারাবাহিকতা। ঝাড়গ্রাম ও পুরুলিয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ঘুরে সে মানুষের 'origin' বা আদিসত্তার সন্ধান করতে চায়। মহেঞ্জোদড়ো–হরপ্পার সভ্যতার সঙ্গে আদিবাসী সংস্কৃতির ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক যোগসূত্র অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে বাণী বসু ভারতের প্রাচীন ও অবহেলিত ইতিহাসের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

"হড় জাতির এক্সোডাস শুরু হয়েছে সুদূর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত থেকে। সাসাংবেডা থেকে গোত্র ভাগ হয়ে জারপি দেশ, সেখানেও টিকতে পারা গেল না, জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে আসতে আসতে এক বিশাল পর্বত পথ আটকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মারাংবুরুর অর্থাৎ জঙ্গলের দেবতার পূজা করে সে পথ বা সিংদুয়ার খুলল। সেখান থেকে বাঁয়ে এসে আয়রে' দেশ, তারপর 'কাঁয়ড়ে' দেশ, তারপর 'চাঁই' দেশ-দুটো পথ ছিল চাম্পাদুয়ার আর চাঁইদুয়ার। চাম্পাতে আমরা স্বাধীন ছিলাম, প্রত্যেক গোত্রের আলাদা গড় ছিল। তারপর সেই একই ইতিবৃত্ত। দিকুরা এসে সব কেড়ে নেয়। জঙ্গল পরিষ্কার করে বসত স্থাপন করলেই দিকুরা নিয়ে নেয়। চাম্পা পর্যন্ত আমাদের হড় জাতির এক ইতিহাস। তারপর মুণ্ডা, শবর, কুঁড়বি ধীরে ধীরে আলাদা হয়ে গেল। চম্পা থেকে তড়েপুখুড়ি, আবার তাড়া তারপর বাড়িবারওয়া। তারপর শিরে দেশ বা শিকার দেশ। শিকার রাজার সমস্ত জঙ্গল পরিষ্কার করলাম কিন্তু দিকুরা সেখান থেকেও আমাদের তাড়াল। অজয় নদ পার হওয়া আমাদের পূর্বপুরুষের বারণ ছিল। কিন্তু পেটের দায়ে গুটিপোকার মতো এই সাঁওতাল পরগনায় চলে এসেছি। আর একদিন আর কোথাও চলে যাব। ঝাড়খণ্ড কি আর শেষ পর্যন্ত আমাদের আশ্রয় দিতে পারবে?"[৬]

কাজল সিং-এর বর্ণনায় হড় জাতির দীর্ঘ পরিযান, ক্রমাগত উৎখাত ও বিভাজনের ইতিহাস উঠে আসে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত থেকে শুরু করে বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে বেড়ানো, জঙ্গল পরিষ্কার করে বসতি স্থাপন, আবার বহিরাগত 'দিকু'দের দ্বারা উৎখাত হওয়া—এই পুনরাবৃত্ত ইতিহাস এক গভীর মানবিক ট্র্যাজেডির ইঙ্গিত বহন করে। খাদ্যের সন্ধানে নিজেদের সংস্কার ভেঙে অজয় নদ পার হওয়া, অরণ্য ধ্বংস করে চাষযোগ্য জমি তৈরি করা—সবশেষে সেই জমি থেকেও বিতাড়িত হওয়া—এই অভিজ্ঞতা ভারতের আদিবাসী সমাজের এক নির্মম ইতিহাসকে সামনে আনে। 'উজান-যাত্রা' উপন্যাসে বাণী বসু এই অকথিত ইতিহাসকে অত্যন্ত সংবেদনশীল ও শিল্পিত ভঙ্গিতে উপস্থাপন করেছেন। আর্য ও তথাকথিত উন্নত মানুষের হাতে আদিবাসী সমাজের যে দীর্ঘকালীন নিপীড়ন ও উৎখাতের ইতিহাস, তা মূলধারার ইতিহাসচর্চায় প্রায়ই উপেক্ষিত। বাণী বসু সেই অবহেলিত ইতিহাসকে উপন্যাসের মাধ্যমে নতুন করে আলোয় আনেন। এখানে ইতিহাস কোনো নির্দিষ্ট সময়ের দলিল নয়; বরং তা মানুষের অস্তিত্বসংগ্রাম, স্মৃতি ও যন্ত্রণার ধারাবাহিক বিবরণ। এইভাবে 'জন্মভূমি মাতৃভূমি' ও 'উজান-যাত্রা'—এই দুই উপন্যাসে বাণী বসুর ইতিহাসচেতনা ভিন্ন ভিন্ন স্তরে প্রকাশিত হয়েছে। একদিকে প্রবাসী মানসের স্মৃতিতে ধরা পড়া সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ইতিহাস, অন্যদিকে আদিবাসী সমাজের দীর্ঘ ও অবহেলিত মানবিক ইতিহাস—উভয় ক্ষেত্রেই ইতিহাস তাঁর উপন্যাসে ঘটনাপঞ্জি নয়, বরং মানবজীবনের গভীর অভিজ্ঞতার অংশ হয়ে উঠেছে।

'মৈত্রেয় জাতক' উপন্যাসের ঐতিহাসিক চরিত্র সম্পর্কে বাণী বসু নিজেই স্পষ্ট অবস্থান নিয়েছেন। নিবেদন অংশে তিনি জানিয়েছেন যে এই গ্রন্থ বুদ্ধের জীবনকথা নয়, আবার একে ঐতিহাসিক রোমান্স বলাও সমীচীন হবে না। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, এটি মূলত একটি নির্দিষ্ট সময়কালের পুনর্নির্মাণ—যে সময়কাল বর্তমান সংকটময় বাস্তবতায় নতুন করে ফিরে দেখার দাবি রাখে। এই পুনর্নির্মাণ কল্পনাশ্রয়ী হলেও তা ঐতিহাসিক তথ্য ও সত্যকে অবজ্ঞা করে নির্মিত নয়। এই মন্তব্য থেকেই বোঝা যায়, উপন্যাসটির ভিত্তিতে ইতিহাস ও কল্পনার এক সুসংহত সমন্বয় বিদ্যমান।

"যতই আদরিণী হই তিষ্য, আমরা এই সাকেতের, রাজগৃহের, শ্রাবস্তীর, বারাণসীর সর্বত্র যেখানে যে আছি যত নারী, সবাই বন্দিনী। আভিজাত্য একটা ছলমাত্র। সুকৌশলে বন্দিত্ব আমাদের অভ্যাস করিয়ে নেওয়া।"[৭]

যদিও 'মৈত্রেয় জাতক' গৌতম বুদ্ধের জীবনকাহিনি নয়, তবুও উপন্যাসটির কাহিনিপট নির্মাণে বুদ্ধকালীন ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ফলে ইতিহাসের একটি নির্দিষ্ট সময়কাল উপন্যাসটির কাঠামোকে নিয়ন্ত্রণ করেছে, এবং সেই সঙ্গে বৌদ্ধদর্শনের নানা অনুষঙ্গ স্বাভাবিকভাবেই কাহিনির ভেতরে প্রবেশ করেছে। এই কারণেই উপন্যাসটি একদিকে ঐতিহাসিক সময়চেতনায় নির্মিত, অন্যদিকে বৌদ্ধদর্শনের নৈতিক ও মানবিক ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত। আলোচ্য উপন্যাসে ইতিহাস কোনো মুখ্য আখ্যান নয়, বরং দর্শনচিন্তার পটভূমি হিসেবে কাজ করেছে—যার ওপর দাঁড়িয়ে বৌদ্ধ ভাবনার বিশ্লেষণ সম্ভব হয়েছে।

"রাণীর জীবন এক অতলস্পর্শী শূন্যতা।... সুমনা আমি পারিনি, আমাকে বিবাহ করবার অল্পদিন পরেই দেখলাম, ছেল্লনার গৃহেই তাঁকে বেশি সময় কাটাতে হয়। নইলে বৈশালীর লিচ্ছিবিরা কুপিত হবে। শুধু রূপ নয়, আমার প্রণয়ই বা আদৃত হল কই?"[৮]

খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারত ছিল বহুধাবিভক্ত, যেখানে ষোড়শ মহাজনপদের মধ্যে মগধ ছিল অন্যতম শক্তিশালী। বিম্বিসার রাজনৈতিক দক্ষতায় ক্ষমতায় এসে বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে অবস্থান সুদৃঢ় করেন। উপন্যাসে তিনি শুধু শাসক নন, বরং অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরিত মানবসত্তা হিসেবে চিত্রিত—অসংযম থেকে আত্মসংযমে তাঁর নৈতিক বিবর্তন লক্ষণীয়। অম্বপালীর প্রসঙ্গে তাঁর আত্মস্বীকার এই মানসিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়। বৌদ্ধ দর্শনের সংস্পর্শে এসে বিম্বিসারের রূপান্তর, বেনুবন বিহার দান, ক্ষেমার সন্ন্যাস গ্রহণ ও অজাতশত্রুর পিতৃহত্যা-পরবর্তী অনুশোচনা—এই ঐতিহাসিক ঘটনাগুলিকে বাণী বসু কেবল তথ্যরূপে নয়, বরং নৈতিকতা, ক্ষমতা ও আত্মউপলব্ধির প্রশ্ন উন্মোচনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছেন। ফলে বলা যায়, 'মৈত্রেয় জাতক' উপন্যাসে ইতিহাস কোনো স্বতন্ত্র বিষয় হয়ে ওঠেনি; বরং তা বৌদ্ধদর্শনের আলোকে মানবজীবনের সংকট ও উত্তরণের পটভূমি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্য দিয়েই বাণী বসু ইতিহাসকে পুনর্নির্মাণ করেছেন—তথ্যের পুনরুক্তি নয়, বরং দার্শনিক ও মানবিক অর্থে ইতিহাসকে নতুনভাবে পাঠের সুযোগ সৃষ্টি করেছেন।

বাণী বসুর **মৈত্রেয় জাতক** উপন্যাসে বুদ্ধ ও বৌদ্ধদর্শনের উপস্থাপনা কেবল ধর্মতাত্ত্বিক আলোচনায় সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা মানবজীবনের দুঃখবোধ, মুক্তির আকাঙ্ক্ষা এবং নৈতিক দায়িত্ববোধের সঙ্গে যুক্ত হয়ে শিল্পিত রূপ পেয়েছে। উপন্যাসে বুদ্ধের

উপদেশগুলিকে নাটকীয় বক্তৃতা হিসেবে নয়, বরং চরিত্রের অভিজ্ঞতা ও আত্মোপলব্ধির মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে উন্মোচিত করা হয়েছে। বুদ্ধের দর্শনের কেন্দ্রে রয়েছে দুঃখের সর্বব্যাপী উপস্থিতি। মানবজীবনে জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, বিচ্ছেদ, অপমান—এই সব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই দুঃখ নানারূপে আত্মপ্রকাশ করে। বুদ্ধ এই দুঃখকে কোনো দৈবশক্তি, ঈশ্বর বা প্রকৃতির আকস্মিক আঘাত বলে ব্যাখ্যা করেননি। আবার আত্মা বা বহির্জগতের দ্বন্দ্ব থেকেও দুঃখের উৎস নির্ণয় করেননি। তাঁর অনুসন্ধানে দুঃখের প্রকৃত কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে তৃষ্ণা বা তনহা—অতৃপ্ত ভোগেচ্ছা, যা মানুষকে জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে আবদ্ধ করে রাখে। এই তৃষ্ণা যতদিন বর্তমান, ততদিন দুঃখের অবসান সম্ভব নয়; আর তৃষ্ণার নিবৃত্তিতেই মুক্তির সম্ভাবনা নিহিত— "তথাগতকে আমি... যখন দেখলাম! তিনি প্রতীত্যসমুৎপাদতত্ত্ব ব্যাখা করছিলেন। কী বলব সুমনা, আমি যেন চোখের সামনে দেখলাম আমি জরতী হয়ে যাচ্ছি, ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছি, সামান্যতম মর্যাদাও আর কেউ আমায় দিচ্ছে না। ওই মৃত্যু এসে আমায় গ্রাস করল, তৃষ্ণা গেল না, প্রণয়ের তৃষ্ণা, মর্যাদার তৃষ্ণা, সন্তানের তৃষ্ণা, আবার জন্মালাম, আমার যৌবনকষ্ট, জরাকষ্ট, মৃত্যুদুঃখ, চক্র ঘুরছে, ভবচক্র। নথি রাগসমো অগ্নি, নথি দোসসমো কলি।/ নথি খন্দাদিসা দুক্খা, নথি সন্তিপরং সুখম।। আকাঙ্ক্ষার সমান আগুন আর নেই। শরীরের মতো দুঃখময়ও আর কিছু নেই। শান্তি, শান্তি, শান্তির মতো সুখও আর নেই।"[৯]

এই উপলব্ধির উপর ভিত্তি করেই বুদ্ধ চারটি আর্যসত্যের কথা বলেছেন। প্রথম আর্যসত্যে জীবনের দুঃখময় বাস্তবতাকে স্বীকার করা হয়েছে। দ্বিতীয় আর্যসত্যে দুঃখের কারণ অনুসন্ধান করা হয়েছে। তৃতীয় আর্যসত্যে দুঃখের অবসানের সম্ভাবনা নির্দেশ করা হয়েছে এবং চতুর্থ আর্যসত্যে সেই অবসানের পথ বা উপায় নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এই পথই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, যা নৈতিকতা, সংযম, সচেতনতা ও ধ্যানের সমন্বয়ে গঠিত। বুদ্ধের মতে, এই পথ অনুসরণ করলেই মানুষ ধীরে ধীরে দুঃখমুক্তির দিকে অগ্রসর হতে পারে। উপন্যাসে এই দর্শন কেবল তাত্ত্বিক আলোচনায় সীমাবদ্ধ না থেকে চরিত্রদের মানসিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। যেমন, মগধরাজ বিম্বিসারের পত্নী ক্ষেমার অভিজ্ঞতায় প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্বের গভীর তাৎপর্য ধরা পড়ে। ক্ষেমা উপলব্ধি করেন যে জন্ম, যৌবন, জরা ও মৃত্যুর আবর্ত এক অবিরাম চক্রের মতো ঘুরে চলেছে, যেখানে আকাঙ্ক্ষা ও তৃষ্ণাই মানুষকে বারবার বেঁধে রাখছে। এই চক্র থেকে মুক্তি তখনই সম্ভব, যখন তৃষ্ণার শিকড় উপড়ে ফেলা যায়। তাই বলা যায়— "বুদ্ধদেবের তপস্যালব্ধ জ্ঞান বা উপদেশ বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধদর্শনের মর্মবাণী। বুদ্ধদেব মুখে মুখে তাঁর বাণী প্রচার করতেন। বুদ্ধদেবের তিরোধানের পর তাঁর শিষ্যরা তাঁর উপদেশগুলিকে পালি ভাষায় গ্রন্থের আকারে সংরক্ষিত করেন। এই গ্রন্থগুলিকে বলা হয় পিটক।"[১০]

প্রতীত্যসমুৎপাদ বৌদ্ধদর্শনের অন্যতম কেন্দ্রীয় তত্ত্ব। এই তত্ত্ব অনুসারে কোনো ঘটনাই আকস্মিক নয়; প্রতিটি ঘটনার পেছনে নির্দিষ্ট কারণ সক্রিয় থাকে। অবিদ্যা থেকে শুরু করে সংস্কার, বিজ্ঞান, নামরূপ, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, ভব, জাতি এবং জরা-মরণের মধ্য দিয়ে যে দ্বাদশাঙ্গ চক্র আবর্তিত হয়, তাকেই ভবচক্র বা সংসারচক্র বলা হয়। এই চক্রের মূল উৎস অবিদ্যা, আর অবিদ্যার নিবৃত্তিতেই নির্বাণলাভ সম্ভব। উপন্যাসে এই দার্শনিক তত্ত্ব মানবজীবনের দুঃখ ও অনিশ্চয়তার ব্যাখ্যা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

"তথাগত যে অষ্টাঙ্গিক মার্গের উপদেশ দেন সাধারণ মানুষকে, সেইটুকু সারাজীবন ধরে পালন করে গেলেই তো একটি পাপহীন, নির্দোষ, চমৎকার সমাজ, দেশ গড়ে উঠতে পারে। সেটা কি মস্ত বড় কথা নয়? শরীরকে কষ্ট দিতে হবে না, যে যেমনভাবে যেখানে অবস্থিত সেখানে থেকেই জীবনধারণ করবে, শুধু জীবনের প্রতি, মানুষের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গিটি পরিবর্তিত হয়ে যাবে। গৃহস্থদের জন্য তথাগত আরও সহজ নির্দেশিকা দিয়েছেন-পঞ্চশীল। প্রাণিবধ না করা, পরদ্রব্য না হরণ করা, ব্যভিচার না করা, মিথ্যা না বলা, সুরাপান না করা-এ-ও কি অতিশয় কঠিন?... উনি অনর্থক প্রাণিবধ অর্থাৎ মৃগয়া, যাগ-যজ্ঞাদিতে বলি এইগুলি বারণ করেন। প্রয়োজনে মৎস মাংসাদি তো উনি নিজেও খান। শ্রমণদেরও খেতে বারণ করেন না। তবে ওঁকে নিমন্ত্রণ করে পশুহত্যা করা ওঁর মনোমত নয়। ... আর ব্যভিচার, প্রবঞ্চনা, মিথ্যাচরণ এগুলি যে সমাজদেহে ঘৃণ্য রোগের মতো ছড়িয়ে যাচ্ছে। এগুলিকে যে নির্মূল করা প্রয়োজন ... পরিপূর্ণ সভ্য সমাজের দিকেই তো আমাদের গতি হওয়া উচিত। এবং সেই সভ্য সমাজ তো ওই সকল পাপ-অভ্যাস দূর করার চেষ্টা থেকেই জন্মাবে। ধীরে ধীরে, একদিনে নয়।"[১১]

বৌদ্ধধর্মের সামাজিক রূপও উপন্যাসে গুরুত্বপূর্ণভাবে উঠে এসেছে। বুদ্ধের শরণ গ্রহণের জন্য ত্রিশরণ মন্ত্র উচ্চারণ, প্রব্রজ্যা গ্রহণের প্রক্রিয়া এবং ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের কঠোর নৈতিক বিধিনিষেধ—এই সবই বাণী বসু ক্ষেমার জীবনকাহিনির মধ্য দিয়ে উপস্থাপন করেছেন। দশশীল পালনের মাধ্যমে সংযম, সরলতা ও আত্মশুদ্ধির যে আদর্শ নির্মিত হয়েছে, তা বৌদ্ধসংঘের মূল

ভিত্তি। একই সঙ্গে গৃহস্থদের জন্য নির্ধারিত পঞ্চশীলের মাধ্যমে বুদ্ধ সংসারী জীবনের মধ্যেও নৈতিকতার চর্চাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তবে উপন্যাসে বাণী বসু বৌদ্ধদর্শনের প্রতি নিঃশর্ত সমর্থন জানিয়ে থেমে যাননি। তিনি এই দর্শনের একটি সামাজিক সংকটের দিকও তুলে ধরেছেন। যদি সমাজের সক্রিয় ও সক্ষম মানুষরা ব্যাপকভাবে সংসারত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তবে সামাজিক কাঠামো ভেঙে পড়ার আশঙ্কা থেকেই যায়। এই দ্বন্দ্বটি সুমনা চরিত্রের কণ্ঠে প্রকাশ পেয়েছে, যেখানে বুদ্ধের আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও সমাজের ভবিষ্যৎ নিয়ে গভীর উদ্বেগ ব্যক্ত হয়েছে। এই প্রশ্নটি অত্যন্ত বাস্তব ও যুক্তিসংগত—নৈতিক আদর্শ ও সামাজিক দায়িত্বের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা না হলে মানবসমাজের ক্ষতি অনিবার্য। এই দ্বন্দ্বের সমাধান বুদ্ধ নিজেই ইঙ্গিত করেছেন মধ্যম পথে। কঠোর ভোগবিলাস যেমন গ্রহণযোগ্য নয়, তেমনি চরম কৃচ্ছ্রসাধনও নয়। সংসারের মধ্যেই সংযম, নৈতিকতা ও সচেতনতার চর্চাই বুদ্ধের প্রকৃত শিক্ষা। উপন্যাসে বিশাখার কণ্ঠে এই উপলব্ধির প্রতিধ্বনি শোনা যায়—গৃহস্থজীবনে থেকেই যদি মানুষ অষ্টাঙ্গিক মার্গ বা পঞ্চশীলের মূল ভাবনাগুলি পালন করে, তবে একটি ন্যায়ভিত্তিক ও মানবিক সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব। বুদ্ধ দার্শনিক জটিলতায় বিশ্বাসী ছিলেন না। আত্মা, ঈশ্বর বা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের চূড়ান্ত রহস্য নিয়ে বিতর্কে তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে নীরব থেকেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে এইসব প্রশ্ন মানুষের দুঃখমুক্তির পথে কোনো সহায়তা করে না। বরং নৈতিক কর্ম, সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং অহিংস জীবনচর্চার মাধ্যমেই মানবজীবনের সার্থকতা অর্জন সম্ভব।

উপন্যাসের অন্তিম পর্বে অজাতশত্রুর অনুশোচনা ও আত্মগ্লানি এই দর্শনের বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। পিতৃহত্যার মতো গুরুতর পাপের বোঝা নিয়ে সে বুদ্ধের শরণাপন্ন হয়। সেখানে বুদ্ধের উপদেশ আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক পুনর্গঠনের দিকেই ইঙ্গিত করে—অযথা তাত্ত্বিক বিতর্ক নয়, বরং সৎ কর্ম ও সৎ চিন্তার মধ্য দিয়েই জীবনের রূপান্তর সম্ভব।

“সৎ কর্ম, সৎ সঙ্কল্প, সৎ চিন্তার মধ্য দিয়ে জীবনকাল কাটিয়ে পৌঁছও এক অনির্বাণ প্রশান্তিতে-যার নাম নির্বাণ। নির্বাণ কী? কেমন? তা ভাষার অতীত, বর্ণনার অতীত। কেমন সে কথা ভেবে অনর্থক কালক্ষেপ করে কাজ নেই... হে রাজগহবাসী, আমি কি একবারও তোমাদের বলেছি এসো এসো। তোমরা তথাগতর শরণ নাও, তাহলেই আমি তোমাদের এ সকল প্রশ্নের উত্তর দেবো। এমন বচন দিয়েছি কী?... জগৎ শাশ্বত বা অশাশ্বত, আত্মা আছে কিনা, মৃত্যুর পর কী ঘটবে এ সকল উত্তর-প্রত্যুত্তরে শুধু কালক্ষেপই হবে, জরা, মরণ, পরিদেব, শোক এগুলির থেকে মুক্তি হবে না। তথাগত যেসব বিষয়ে চর্চা করেননি সেগুলি চর্চার অযোগ্য জানবে। অস্ত্র ব্যতীত, হিংসা ব্যতীত এক সুন্দর জীবন গঠনের চেষ্টায় নিয়োজিত হও।”[১২]

মৃত্যুর পূর্বে বুদ্ধের শেষ বাণীতে মানবজীবনের মৌলিক সত্যটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে—মানুষ নিজেই নিজের আশ্রয়। কোনো অবতার বা মুক্তিদাতা এসে মানুষের পরিবর্তে মুক্তি এনে দেবে না; পথ দেখানো ছাড়া আর কিছুই তাঁর কাজ নয়। ভবিষ্যতে মৈত্রেয় বুদ্ধের আগমনের ইঙ্গিতও এই দায়িত্ববোধকে খর্ব করে না, বরং মানবজাতির ধারাবাহিক নৈতিক অভিযাত্রার প্রতীক হয়ে ওঠে। এইভাবে মৈত্রেয় জাতক উপন্যাসে বাণী বসু বুদ্ধ ও বৌদ্ধদর্শনকে ধর্মীয় উপদেশের সীমা ছাড়িয়ে মানবজীবনের দুঃখ, দায়িত্ব ও মুক্তির এক গভীর দার্শনিক অনুসন্ধানে রূপান্তরিত করেছেন। ইতিহাস, দর্শন ও সাহিত্য এখানে পরস্পরের সঙ্গে মিশে এক পরিণত শিল্পরূপ সৃষ্টি করেছে।

‘অষ্টম গর্ভ’ উপন্যাসের মূল কাহিনি শুরু হওয়ার পূর্বে বাণী বসু ‘পূর্বরঙ্গ’ শিরোনামে একটি পৃথক অংশ সংযোজন করেছেন। এই অংশে তিনি মানবসভ্যতার ইতিহাসে আবির্ভূত কয়েকজন অবতারপুরুষ ও মহামানবের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। কৃষ্ণ, গৌতম বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য, যিশু খ্রিষ্ট এবং নবী মহম্মদের মতো ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সঙ্গে তিনি আধুনিক কালের কয়েকজন রাষ্ট্রনায়ক ও মানবসেবীর নামও উল্লেখ করেছেন। এই তালিকাভুক্তির মধ্য দিয়ে লেখিকা মহামানবের পুনরাবির্ভাব সংক্রান্ত এক গভীর মানবিক প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন—সভ্যতার সংকটকালে আদৌ কি এমন কোনো মুক্তিদাতা আবির্ভূত হতে পারেন, যিনি মানবজাতিকে নতুন দিশা দেখাবেন। এই প্রসঙ্গে গৌতম বুদ্ধের অবয়ব ও উপস্থিতি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বাণী বসু এখানে বুদ্ধকে কেবল ঐতিহাসিক বা ধর্মীয় চরিত্র হিসেবে নয়, বরং এক দার্শনিক সত্তা হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর শান্ত অথচ দীপ্ত উপস্থিতি, সংযমী ভঙ্গি ও প্রতীকী মুদ্রার মধ্য দিয়ে বুদ্ধের দর্শন যেন দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। এই বর্ণনায় বুদ্ধের দেহরূপের পাশাপাশি তাঁর বাণীও গুরুত্ব পেয়েছে—যেখানে ভোগের বিপরীতে ত্যাগ, প্রাচুর্যের বিপরীতে দারিদ্র্যের সৌন্দর্য এবং আত্মসংযমের কথা উচ্চারিত হয়েছে।

“সহসা তাঁহার চক্ষু হইতে অগ্নি অন্তর্ধান করিল। গাত্রবর্ণ ফেকাশে হইতে লাগিল। তিনি এক হাত কনুই ভাঙিয়া ফণার মতো উপরে তুলিয়া আর এক হাত শস্য ঝাড়িবার কুলার মতো নিম্নমুখী করিয়া বরাভয় মুদ্রায় দাঁড়াইলেন। কুঞ্চিত কেশ সদ্য গজাইয়া মস্তকময় পাকাইয়া পাকাইয়া রহিয়াছে। মস্তকের শীর্ষভাগ সামান্য উঁচু। রক্ত গৈরিক ত্রিচীবর তাঁহার পদ্মপলাশবর্ণ গাত্রে বড়ই মানাইয়াছে। কেশবধৃত বুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে। দেখিলাম ইনি পুরাপুরি গান্ধার আর্টের নহেন। আবার পুরাপুরি মোঙ্গলীয় ধাঁচেরও নহেন। অজন্তার এক নং গুহার উপবিষ্ট মূর্তিটিরই মতো উদাসে কোমলে মুখরুচি। সবিনয়ে বলিলাম, ‘ভন্তে, আপনি আবার কেন? সভ্যজগৎ অর্থাৎ পশ্চিম-গোলার্ধ এমনিতেই ভেজ হইয়া যাইতেছে। পূর্বাঞ্চলে আবার মাংসাদিও ঘাসের ন্যায় স্বাদযুক্ত। আপনিই ত্যাগ হইয়া যাইবে।’ না -’তথাগত তো পৃথিবীকে ভেজ করিতে আইসেন নাই।’ -’শুনিয়াছি বটে, ভিক্ষান্নে মৎস্য-মাংসাদিতে আপনি আপত্তি করিতেন না। যাহা হউক আপনার বিশেষ বিশেষ সম্বাদ কী?’ -’দরিদ্র সুন্দর। দারিদ্র্য সুন্দর। ভোগ সুখ ত্যাগই একমাত্র পথ।’ – ‘শুনিয়াছিলাম যেন আপনি মধ্যপন্থার সুপারিশ করিয়াছিলেন?’ ভগবান বলিলেন, ‘ওই হইল আর কি!’”[১৩]

লেখিকা বুদ্ধের মুখ দিয়ে দারিদ্র্যকে ‘সুন্দর’ বলে অভিহিত করিয়ে ভোগবাদী সভ্যতার প্রতি একটি মৌন প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছেন। আধুনিক পৃথিবীর ভোগলিপ্সা, অতিভোগ ও লালসার সংস্কৃতির প্রেক্ষিতে বুদ্ধের এই বক্তব্য এক গভীর নৈতিক তাৎপর্য বহন করে। যদিও বুদ্ধ ঐতিহাসিকভাবে মধ্যপন্থার কথা বলেছেন, তবু উপন্যাসের এই অংশে তাঁর দর্শন এক ধরনের আত্মসংযমমূলক জীবনবোধের প্রতীক হয়ে ওঠে। অতএব বলা যায়, ‘পূর্বরঙ্গ’ অংশে বুদ্ধের উপস্থিতি ‘অষ্টম গর্ভ’ উপন্যাসের দার্শনিক ভিত্তি নির্মাণে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। এই অংশের মাধ্যমে বাণী বসু ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, মানবসভ্যতার সংকট কোনো নির্দিষ্ট কালের সমস্যা নয়; বরং তা পুনরাবৃত্ত। আর সেই সংকটের মোকাবিলায় বুদ্ধের জীবনদর্শন আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক ও অনুসরণযোগ্য।

‘খনামিহিরের ঢিপি’ উপন্যাসের প্রসঙ্গ আলোচনায় বাণী বসু বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের ঐতিহ্যিক সূত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বিশেষত বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ ‘ত্রিপিটক’-এর উল্লেখ উপন্যাসের ঐতিহাসিক ও দার্শনিক পরিমণ্ডলকে সুদৃঢ় করেছে। গৌতম বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর অল্প সময়ের মধ্যেই মগধের রাজগৃহে প্রথম বৌদ্ধসঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়। এই সঙ্গীতিতে ভিক্ষু মহাকাশ্যপের নেতৃত্বে বুদ্ধের উপদেশ ও শাসনসংক্রান্ত বক্তব্যসমূহ সংকলিত হয়ে ‘ত্রিপিটক’-এর রূপ গ্রহণ করে। এই গ্রন্থসংকলনের মধ্য দিয়ে বৌদ্ধ ধর্মের মৌলিক কাঠামো ও তাত্ত্বিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

‘ত্রিপিটক’ শব্দটি মূলত তিনটি পৃথক ‘পিটক’ বা পেটিকার সমন্বয়ে গঠিত। প্রথমটি ‘বিনয়পিটক’, যেখানে সংঘজীবনের শৃঙ্খলা, আচরণবিধি ও সন্ন্যাসীদের নৈতিক অনুশাসন বিস্তারিতভাবে বিধৃত হয়েছে। দ্বিতীয়টি ‘সুত্তপিটক’, যা বুদ্ধের উপদেশ, ধর্মোপদেশ ও সংলাপসমূহের প্রধান ভাণ্ডার হিসেবে বিবেচিত। তৃতীয় ‘অভিধম্মপিটক’-এ বৌদ্ধ দর্শনের সূক্ষ্ম তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও মানসিক ক্রিয়াপ্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এর মধ্যে ‘সুত্তপিটক’ আবার পাঁচটি নিকায় গ্রন্থে বিভক্ত—দীর্ঘনিকায়, মজ্ঝিমনিকায়, সংযুক্তনিকায়, অঙ্গুত্তরনিকায় এবং খুদ্দকনিকায়। এই বিভাগবিন্যাস বুদ্ধবচনের বিষয়গত ও আকারগত বৈচিত্র্যকে সুসংগঠিতভাবে উপস্থাপন করেছে। উপন্যাসে ‘ত্রিপিটক’-এর এই প্রসঙ্গের অন্তর্ভুক্তি নিছক তথ্যউল্লেখের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এর মাধ্যমে বাণী বসু প্রাচীন ভারতীয় বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও জ্ঞানপরম্পরার ধারাবাহিকতাকে সাহিত্যিক প্রেক্ষাপটে পুনঃস্থাপন করেছেন।

ফলে ‘খনামিহিরের ঢিপি’ উপন্যাসে বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের উল্লেখ ইতিহাস ও দর্শনের সংযোগস্থলে দাঁড়িয়ে থাকা এক গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হিসেবে চিহ্নিত হয়, যা উপন্যাসের বৌদ্ধ চেতনা ও ঐতিহাসিক গভীরতাকে আরও বিস্তৃত করেছে।

‘উত্তরসাধক’ উপন্যাসে বৌদ্ধধর্মের প্রসঙ্গ কেবল ঐতিহাসিক উল্লেখ হিসেবে নয়, এক গভীর মানবিক দর্শনের বাহক হিসেবে উপস্থিত হয়েছে। বাণী বসু এখানে দেখাতে চেয়েছেন যে, প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতার মধ্যে যে ঐক্যের বীজ রোপিত হয়েছিল, তার অন্যতম ভিত্তি ছিল বৌদ্ধধর্মের সহিষ্ণুতা-নির্ভর আদর্শ। সম্রাট অশোক এই আদর্শকে রাষ্ট্রচিন্তার সঙ্গে যুক্ত করে এক বিস্তৃত সাম্রাজ্যকে সাংস্কৃতিক ও নৈতিক সূত্রে আবদ্ধ করতে সক্ষম হন। তার পূর্ববর্তী সময়ে ভারতবর্ষ ছিল নানা ক্ষুদ্র শক্তির সংঘাতে বিভক্ত; পারস্পরিক সহযোগিতার বদলে বিরোধই ছিল প্রধান সুর।

“এই বৌদ্ধ শ্রমণগুলো গুহার পর গুহা ভরতি করে নুড এঁকে রেখেছে খালি। কোনও সন্দেহ নেই, প্রব্রজ্যা গ্রহণ করবার পর নির্জন গুহায় দিনের পর দিন নারীসঙ্গহীন কাটাতে কাটাতে লিবিডোর তাড়নায় এইসব চিত্রশিল্পের জন্ম। যেমন খাজুরাহো, যেমন

কোণারক, যেমন জগন্নাথ-মন্দির। ওদের গুরুগুলো অর্হৎ না ফর্হৎ তারাও এইসব ব্লু-ফিল্ম দেখে দিব্যি আহ্লাদে থাকত। তাতে বিক্রমের বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। কিন্তু ব্লু ফিল্মকে ব্লু-ফিল্মই বল না বাছা! কে আপত্তি করছে। ধম্মের পোশাক পরিয়ে ধোঁকা দেবার চেষ্টা করলে যে গায়ে জ্বালা ধরে। বামাচারী তান্ত্রিকদের কারণবারি আর ভৈরবীচক্রের মতো আর কী। তবে ছবিগুলোকে যথেষ্ট কামোদ্দীপক করতে পারেনি। খাজুরাহো চৌষট্টি যোগিনী দেখে যেমন ঘেমে নেয়ে যেতে হয়। এগুলো সেরকম নয়। কেমন ম্যাটমেটে, নিরামিষ নিরামিষ, কথক কী মোহিনীঅট্টম এর কাছে যেমন রবীন্দ্র-নৃত্য 'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে।' বেশ গরগরে মাটন দো পিয়াজা, মুর্গ মুসল্লম, নিদেনপক্ষে বিফ কাবাব না হলে বিক্রমের ঠিক জমে না। তার ওপর আর্ধেক রং উঠে গেছে, পলেস্তারা খসে গেছে, দিমাগ খারাপ না হলে কেউ এর জন্য গোটা একটা দিন নষ্ট করে?"[১৪]

এই প্রেক্ষাপটে বৌদ্ধধর্ম এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আসে—যেখানে সহাবস্থান, করুণা ও সহনশীলতা প্রধান মূল্যবোধ। উপন্যাসের মেধা ভাটনগর চরিত্রের বক্তব্যে এই ধারণাই প্রতিফলিত হয়েছে। তার দৃষ্টিতে বৌদ্ধধর্মের সারমর্ম হলো 'টলারেন্স', যা কেবল ধর্মীয় সহিষ্ণুতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং পরিবার, সমাজ, এমনকি সমগ্র জীবজগতের প্রতি দায়িত্ববোধ ও সহমর্মিতার শিক্ষা দেয়।

"সারনাথ। ধর্মচক্র মুদ্রায় আসীন সিদ্ধার্থ, সদ্য বুদ্ধত্ব লাভ করেছেন, বলছেন-হে পঞ্চ সন্ন্যাসী, এই বন্ধনদুঃখের মূল কারণ অবধান করো। কামনা-বাসনাই এ দুঃখের মূল। ইন্দ্রিয়জ সুখের কামনা, আত্মতৃপ্তির বাসনা। এ দুঃখের মূল উৎপাটনের উপায় কী? কামনা বাসনাকে নিঃশেষে পরিত্যাগ করাই এর মূলোচ্ছেদের প্রকৃত উপায়।"[১৫]

এইভাবে বাণী বসু ইতিহাসকে নিছক ঘটনাপুঞ্জ হিসেবে না দেখে, তার অন্তর্নিহিত মানবিক বোধকে অন্বেষণ করেছেন। 'উত্তরসাধক'-এ বৌদ্ধধর্ম তাই একদিকে যেমন অতীতের রাজনৈতিক ঐক্যের সূত্র, তেমনি অন্যদিকে আধুনিক সমাজের জন্যও এক প্রাসঙ্গিক নৈতিক।

"বুদ্ধদেব গৃহীদেরও বৌদ্ধ হবার অধিকার দিয়েছিলেন। অষ্টাঙ্গিক মার্গে চলবে তারা। বৌদ্ধ হওয়া না-হওয়াটা বড় কথা নয়। কোনও বিশেষ ধর্মে বাইরে থেকে নাড়া বেঁধে বসলে বা না বসলে কিছু যায় আসে না।"[১৬]

বাণী বসুর উপন্যাসসমূহে ইতিহাসচেতনা ও বৌদ্ধ দর্শনের উপস্থিতি ও কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আলোচনায় স্পষ্ট হয়েছে যে, বাণী বসু ইতিহাসকে কোনো নিরেট বা প্রামাণ্য বয়ান হিসেবে গ্রহণ করেননি; বরং ইতিহাস তাঁর উপন্যাসে রূপ পেয়েছে মানবজীবনের অভিজ্ঞতা, স্মৃতি ও নৈতিক সংকটের মধ্য দিয়ে। ফলে ইতিহাস এখানে রাজনীতি বা ক্ষমতার ধারাবিবরণী না হয়ে ব্যক্তিমানুষের আত্মসংকট ও সামাজিক বাস্তবতার প্রতিফলন হয়ে উঠেছে। তাই রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে পারি—"ভগবান বুদ্ধ বলেছেন, অক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে জয় করবে... মানুষের শক্তি অক্রোধে, ক্ষমাতে... ক্রোধকে জয় করবে অক্রোধের দ্বারা, নিজের ক্রোধকে এবং অন্যের ক্রোধকে। এ না হলে মানুষ ব্যর্থ হবে, যেহেতু সে মানুষ।"[১৭]

বাণী বসুর নকশাল আন্দোলনকেন্দ্রিক উপন্যাসে সমসাময়িক রাজনৈতিক ইতিহাসকে ব্যর্থ মতাদর্শ ও মানবিক বিপর্যয়ের আলোকে বিচার করা হয়েছে। আন্দোলনের তাত্ত্বিক দুর্বলতা, সংগঠনের অভাব এবং তার ফলে সৃষ্ট ব্যক্তিগত ও সামাজিক ক্ষয় তাঁর রচনায় বিশেষ গুরুত্ব পায়, যা প্রচলিত বীরত্বকেন্দ্রিক ইতিহাসপাঠকে প্রশ্ন করে। অন্যদিকে জন্মভূমি মাতৃভূমি ও উজান-যাত্রা উপন্যাসে ইতিহাস স্মৃতি, প্রবাস ও শিকড়চ্যুতির অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বহুস্বরিক রূপে প্রকাশিত হয়েছে, যেখানে প্রান্তিক মানুষের জীবনও গুরুত্ব পেয়েছে।

একই সঙ্গে মৈত্রেয় জাতক, অষ্টম গর্ভ ও খনামিহিরের ঢিপি উপন্যাসে বৌদ্ধ দর্শনের অনিত্যতা, দুঃখ ও মধ্যপন্থার ধারণা ইতিহাসচেতনাকে দার্শনিক ভিত্তি দেয়। ফলে ইতিহাস ও বৌদ্ধ ভাবনার সমন্বয়ে বাণী বসু এক মানবকেন্দ্রিক ও সমালোচনামূলক সাহিত্যদৃষ্টির নির্মাণ করেছেন।

তথ্যসূত্র:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, বাংলা সাহিত্যর সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩, পৃ. ১।

২. বসু, বাণী, দশটি উপন্যাস, আনন্দ পাবলিশার্স,২০০২, পৃ. ৯৬।

৩. তদেব, পৃ.১৭০।

৪. তদেব, পৃ.৩৪৩।

৫. তদেব, পৃ. ৬৪-৬৫।

৬. বসু বাণী, উজান-যাত্রা, ২০০৬, পৃ.-১৭৫।

৭. বসু, বাণী, 'মৈত্রেয় জাতক', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৬, পৃ. ৬৩।

৮. তদেব ৮২

৯. তদেব পৃ. ৮৩।

১০. চট্টোপাধ্যায়, মিহির কুমার, মেটে, জয়ন্ত,পান্ডে, প্রণয়, শিক্ষার দার্শনিকভিত্তি, রিতা বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ২৪২।

১১. তদেব, পৃ. ২৯৫-২৯৬।

১২. তদেব, পৃ. ৪২০।

১৩. বসু, বাণী,অষ্টম গর্ভ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৫, পৃ. ৪।

১৪. বসু, বাণী, দশটি উপন্যাস, আনন্দ পাবলিশার্স,২০০২, পৃ. ২৪৮-২৪৯।

১৫. তদেব, পৃ. ২৪৯।

১৬. তদেব, পৃ. ২৪৯।

১৭. চট্টোপাধ্যায়, মিহির কুমার, মেটে, জয়ন্ত,পান্ডে, প্রণয়, শিক্ষার দার্শনিকভিত্তি, রিতা বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ২৫২।

Citation: **Mukherjee. S. & Halder. Dr. C. S.,** (2026) "বাণী বসুর কথাসাহিত্যে ইতিহাসচেতনা ও বৌদ্ধ দর্শন: মধ্যবিত্ত সত্তার পাঠ", *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-4, Issue-04, April-2026.